بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ মোতাবেক ১৪ তবলীগ, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন:

গত খুতবায় হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.)'র স্মৃতিচারণ হয়েছিল এবং (এর) কিয়দাংশ অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল, যা আজ বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। কা'ব বিন আশরাফ-এর হত্যা প্রসঙ্গে একথা বর্ণিত হয়েছিল যে, হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.) তাকে (কোন) অজুহাতে বাড়ি থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেন, এটি কি মিথ্যা (বলা) নয়? এছাড়া এটিও বর্ণিত হয়েছিল, একটি হাদীস অনুসারে কোন কোন আলেমের মতে তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা (বলার) অনুমতি রয়েছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে এটি ভুল দৃষ্টিভঙ্গি অথবা হাদীসের অপব্যাখ্যা যা তিনটি ক্ষেত্রে ভুল কথা বা মিথ্যাকে বৈধ আখ্যা দেয়। যাহোক, সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকের বর্ণনার আলোকে আমি তখন এর ব্যাখ্যা করেছিলাম। কিন্তু এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও স্বীয় পুস্তক **'নূরুল কুরআন'**-এ সবিস্তারে আলোকপাত করেছেন, যা একজন খ্রিষ্টানের আপত্তির উত্তরে তিনি বর্ণনা করেছেন। এর কিছুটা বা এর মধ্য হতে কিয়দাংশ এখন আমি উপস্থাপন করব, যদ্বারা এ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলাম কোনভাবেই মিথ্যা বলার অনুমতি দেয় না। একজন খ্রিষ্টানের আপত্তির খণ্ডন করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, একটি আপত্তি হল,

মহানবী (সা.) (নাকি) তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন আর পবিত্র কুরআনে ধর্মবিশ্বাস গোপন করার জন্য সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ইঞ্জিল ঈমানকে গোপন রাখার অনুমতি দেয়নি! এটি হল আপত্তি। এর উত্তরে তিনি (আ.) বলেন, **'স্পষ্ট হওয়া উচিত, সততার আবশ্যকতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে যতবেশি তাকিদ দেয়া হয়েছে, আমি কোনভাবেই বিশ্বাস করতে পারি না যে, ইঞ্জিলে এর এক দশমাংশও তাগিদ থাকবে।'**

এরপর তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন মিথ্যাকে প্রতিমা পূজা তুল্য আখ্যা দিয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (সূরা আল্ হাজ্জ: ৩১) অর্থাৎ, প্রতিমার অপবিত্রতা এবং মিথ্যার নোংরামি হতে দূরে থাক। অপর একস্থানে বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ (সূরা আন্ নিসা: ১৩৬) অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! সুবিচার ও সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত হও এবং আল্লাহ্‌র খাতিরে সত্য সাক্ষ্য প্রদান কর, এরফলে তোমাদের নিজেদের ক্ষতি হলেও অথবা তোমাদের পিতামাতা এবং তোমাদের নিকটাত্মীয়গণ এসব সাক্ষ্যের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও। তিনি (আ.) সেই আপত্তিকারীকে সম্বোধন করে বলেন, হে খোদাবিমুখ! একটু ইঞ্জিল খোলো আর আমাদের বল, সত্য বলার জন্য এরূপ তাগিদপূর্ণ নির্দেশ ইঞ্জিলের কোথায় আছে?

এরপর ফতেহ্ মসীহ্ নামের সেই খ্রিষ্টানকে সম্বোধন করে তিনি (আ.) পুনরায় লিখেন, মহানবী (সা.) তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন– সত্য কথা হল, আপনার অজ্ঞতার কারণে আপনি এই ভুল ধারণার শিকার হয়েছেন। আসল কথা হল, কোন হাদীসে মিথ্যা বলার মোটেই অনুমতি নেই, বরং হাদীসে যে শব্দ রয়েছে তা হল, اِنْ قُتِلْتَ وَاُحْرِقْتَ অর্থাৎ, যদি তোমাকে হত্যা করা হয় এবং পুড়িয়ে ফেলা হয় তবুও সত্যকে পরিত্যাগ করো না। অতএব যেখানে কুরআন বলে, তোমাদের প্রাণ চলে গেলেও তোমরা ন্যায়বিচার ও সত্যকে পরিত্যাগ করো না এবং হাদীস বলে, যদি তোমাদের পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং হত্যা করা হয় তবুও তোমরা সত্য বল, তাই যদি কুরআন এবং সহীহ্ হাদীসের বিপরীতে এমন কোন হাদীস থেকেও থাকে তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা আমরা সেই হাদীসকেই গ্রহণ করি যা সহীহ্ হাদীস এবং পবিত্র কুরআনের বিরোধী নয়। তিনি বলেন, তবে হ্যাঁ, কোন কোন হাদীসে 'তওরিয়া'-র বৈধতার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়, অর্থাৎ কোন প্রজ্ঞার অধীনে দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা, আর ঘৃণা সৃষ্টির জন্য একেই মিথ্যা নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ যখন কোন দ্ব্যর্থবোধক কথা হয়, সেটিকেই বিরোধীরা বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য মিথ্যার নাম দেয়। তিনি (আ.) বলেন, আর এক অজ্ঞ ও নির্বোধ যখন কোন হাদীসে এমন শব্দ 'তাসামুহ্' (অর্থাৎ সহজ করার উদ্দেশ্যে) লিখিত দেখতে পায়, অর্থাৎ কাউকে বোঝানোর

জন্য বিষয়কে সহজ করার উদ্দেশ্যে যখন কোন শব্দ ব্যবহার করা হয়, তখন সেটিকে হয়ত আক্ষরিক অর্থেই মিথ্যা মনে করে বসবে। কেননা সে সেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অনবহিত যে, আক্ষরিক অর্থে মিথ্যা বলা ইসলামে নোংরা, হারাম বা নিষিদ্ধ এবং শিরক এর সমতুল্য। কিন্তু 'তওরিয়া', যা আসলে মিথ্যা নয়, যদিও মিথ্যার আদলেই অপারগতার সময় জনসাধারণের জন্য হাদীস থেকে এর বৈধতা দেখা যায়, কিন্তু তারপরও লেখা আছে, তারাই উত্তম যারা 'তওরিয়া'-কেও এড়িয়ে চলে। আর ইসলামী পরিভাষায় 'তওরিয়া'-র অর্থ হল, ফিতনা বা অশান্তির ভয়ে একটি কথা গোপন করার জন্য, অথবা অন্য কোন প্রজ্ঞার অধীনে একটি গোপনীয় বিষয়কে গোপন রাখার উদ্দেশ্যে এমনসব উদাহরণ এবং এমনভাবে সেটি বর্ণনা করা যেন বুদ্ধিমান সেটি বুঝতে পারলেও অজ্ঞ তা বুঝবে না পারে এবং তার চিন্তা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়, যা বক্তার উদ্দেশ্য নয়। আর প্রণিধানে বোঝা যাবে, বক্তা যা কিছু বলেছে তা মিথ্যা নয় বরং খাঁটি সত্য; আর তাতে মিথ্যার কোন সংমিশ্রণ থাকবে না আর হৃদয় এক বিন্দুও মিথ্যার প্রতি আকৃষ্ট হবে না। যেমনটি, কোন কোন হাদীসে দু'জন মুসলমানের মাঝে আপোষ করানোর জন্য অথবা নিজের স্ত্রীকে কোন অশান্তি ও দাম্পত্য কলহ এবং ঝগড়া-বিবাদ থেকে দূরে রাখার জন্য কিংবা যুদ্ধে নিজেদের উদ্দেশ্য শত্রুর কাছে গোপন রাখার জন্য এবং শত্রুর দৃষ্টি ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার মানসে 'তওরিয়া'-র বৈধতা পাওয়া যায়। কিন্তু তাসত্ত্বেও অন্য আরো বহু হাদীস রয়েছে যেগুলো থেকে জানা যায়, 'তওরিয়া' উন্নত মানের তাক্বওয়ার পরিপন্থী। প্রাঞ্জল সত্য সর্বাবস্থায় উত্তম, এর কারণে হত্যা করা হলেও এবং আগুনে পোড়ানো হলেও।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, মহানবী (সা.) যতদূর সম্ভব এটি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন যেন বাহ্যত মর্মার্থের দিক দিয়েও কথা মিথ্যা-সদৃশ না হয়। অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, যখন আমি দেখি, নবীদের নেতা মহানবী (সা.) উহুদের যুদ্ধে একাকী অবস্থায় নগ্নতরবারির সামনে বলছিলেন, আমি মুহাম্মদ, আমি আল্লাহ্‌র নবী, আমি আব্দুল মুত্তলিবের সন্তান।

এখানে এটিও স্পষ্ট করে দিতে চাই, যখন পুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছিল এর টীকায় লেখা হয়েছে যে, এটি ভুলে লেখা হয়েছে। এটি হুনায়েন-এর যুদ্ধের ঘটনা, উহুদের যুদ্ধের নয়। অথচ এখন আমাদের রিসার্চ সেল-ই সীরাতুল হালাবিয়া'র রেফারেন্স বের করে আমার কাছে পাঠিয়েছে যাতে লেখা আছে, এই শব্দ মহানবী (সা.) হুনায়েন এবং উহুদ উভয় যুদ্ধে-ই ব্যবহার করেছেন। তাই প্রকাশনা বিভাগ অর্থাৎ নাযারত ইশায়াতকেও ভবিষ্যতে এই টীকা সরিয়ে ফেলা কর্তব্য হবে। অধিকাংশ সময় আমি দেখেছি, কখনো কখনো তড়িঘড়ি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর (ব্যবহৃত) শব্দের অর্থ করার জন্য বা সহজসাধ্যতা সৃষ্টির জন্য টীকায় লিখে দেয়া হয়, এটি ভুল ছিল বা ভুল হয়ে গেছে। অথচ অনেক গবেষণা করা প্রয়োজন এবং অভিনিবেশের প্রয়োজন। যাহোক, এখন আমার সামনে এই উদ্ধৃতি এসে গেছে এবং এতে খুব স্পষ্টভাবে লেখা আছে, উক্ত শব্দ হুনায়েন এবং উহুদ উভয় ক্ষেত্রেই মহানবী (সা.) ব্যবহার করেছেন। যাহোক, এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে গেল।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, যদি কোন হাদীসে তওরিয়াকে 'তাসামুহ্' (অর্থাৎ সহজ করার উদ্দেশ্যে) কিয্‌ব (বা মিথ্যা) শব্দের (মাধ্যমেও) উল্লেখ করা হয়ে থাকে তাহলে এটি চরম অজ্ঞতা। অর্থাৎ কোন শব্দকে সহজ করার জন্য বা বুঝানোর উদ্দেশ্যে যদি কোথাও কিয্‌ব বা মিথ্যা শব্দও লেখা হয়ে থাকে, এটিকে আক্ষরিক মিথ্যা হিসেবে গণ্য করা চরম অজ্ঞতা। কেননা কুরআন ও সহীহ্ হাদীস সর্বসম্মতভাবে প্রকৃত মিথ্যাকে হারাম ও অপবিত্র আখ্যা দেয় এবং উন্নতমানের হাদীস সমূহ 'তওরিয়া'-র বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে। কাজেই, যদি ধরেও নেয়া হয়, কোন হাদীসে 'তওরিয়া' শব্দের স্থলে 'কিয্‌ব' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে এর অর্থ নাঊযুবিল্লাহ্ আক্ষরিক বা প্রকৃত মিথ্যা কীভাবে হতে পারে! বরং এটি এর বর্ণনাকারীর খুবই সূক্ষ্ম তাক্বওয়ার পরিচায়ক হবে যিনি 'তওরিয়া'-কে কিয্‌ব বা মিথ্যার ধরণ জ্ঞান করে বিষয় সহজ করার জন্য কিয্‌ব শব্দ ব্যবহার করেছেন। আমাদের উচিত কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের অনুসরণ করা। যদি কোন বিষয় এর বিরোধী হয় তাহলে আমরা এর এমন অর্থ আদৌ গ্রহণ করবো না যা এগুলোর স্পষ্ট পরিপন্থী।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন মিথ্যাবাদীদের অভিসম্পাত করেছে এবং আরো বলেছে, মিথ্যাবাদীরা শয়তানের দোসর, তারা বেঈমান হয়ে থাকে আর মিথ্যাবাদীদের প্রতি শয়তান অবতীর্ণ হয়। শুধু একথাই বলে নি যে, মিথ্যা বলো না বরং এটিও বলেছে, তোমরা মিথ্যাবাদীদের সঙ্গও পরিত্যাগ কর এবং তাদেরকে নিজের বন্ধু বানিয়ো না, খোদাকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক। (কুরআন) অন্যত্র বলে, যখন তুমি কোন কথা বল তখন তোমার কথা যেন শুধু পূর্ণ সত্য হয়, হাসি-ঠাট্টাচ্ছলেও যেন তাতে কোনরূপ মিথ্যার মিশ্রণ না

থাকে। (নূরুল কুরআন নাম্বার ২, রুহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪০২-৪০৮), {সীরাতুল হালাবীয়া, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩১০, বাব যিকরে মাগাযীহে (সা.) গযওয়ায়ে উহুদ, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত}

পূর্বে যে বিষয়টি আলোচিত হচ্ছিল এর মাধ্যমে তা সুস্পষ্ট হয়ে গেল। এখন হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.)'র অবশিষ্ট জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করছি। বনু নযীর যখন প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে মহানবী (সা.)-এর ওপর যাঁতার (এক) টুকরো ফেলে হত্যা করার চেষ্টা করে তখন আল্লাহ্ তা'লা ওহীর মাধ্যমে এ সম্পর্কে মহানবী (সা.)-কে অবগত করে দেন। তখন মহানবী (সা.) দ্রুত স্বস্থান থেকে উঠে পড়েন, যেন তিনি কোন জরুরী প্রয়োজনে উঠছেন এবং তিনি (সা.) মদীনায় চলে আসেন। মহানবী (সা.)-এর চলে যাওয়ার পর তাঁর (সা.) সাহাবীরাও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তাঁর (সা.) পিছু পিছু মদীনায় চলে আসেন। সাহাবীরা মদীনায় পৌঁছার পর জানতে পারেন, মহানবী (সা.) হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.)-কে ডেকে পাঠিয়েছেন। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি উঠে চলে আসলেন আর আমরা জানতেও পারলাম না! তিনি (সা.) বলেন, ইহুদীরা আমার সাথে প্রতারণা করতে চেয়েছিল, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে (তা) অবগত করলে আমি সেখান থেকে উঠে চলে আসি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (সূরা আল্ মায়েদা: ১২) অর্থাৎ, হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর যা সে সময় প্রদত্ত হয়েছিল যখন এক গ্রোত্র তোমাদের প্রতি হাত প্রসারিত করার সংকল্প করেছিল। সে সময় তিনি তোমাদের থেকে সেই জাতি বা গোত্রের হাতকে বিরত রেখেছেন। আর আল্লাহ্‌র তাক্বওয়া অবলম্বন কর এবং মু'মিনদের আল্লাহ্‌র ওপরই তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা উচিত।

যাহোক, হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.)-কে মহানবী (সা.) ইহুদীদের কাছে প্রেরণ করেন। এ সংক্রান্ত ঘটনাটি এভাবে বিবৃত হয়েছে, যখন হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.) তাঁর (সা.) সকাশে উপস্থিত হন তখন তিনি (সা.) বলেন, বনু নযীরের ইহুদীদের কাছে গিয়ে তাদের বল, আমাকে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) তোমাদের কাছে এই বার্তা দিয়ে প্রেরণ করেছেন যে, তোমরা আমার এই শহর ছেড়ে চলে যাও। তিনি ইহুদীদের কাছে যান। তারা যেহেতু ষড়যন্ত্র করেছিল এবং তাদের চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করে নি, তা ভঙ্গ করেছিল, তাই তাদের শাস্তি এটিই ছিল, তারা যেন শহর থেকে চলে যায়। তিনি (রা.) ইহুদীদের কাছে গিয়ে তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, মহানবী (সা.) আমাকে তোমাদের কাছে একটি বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছেন। কিন্তু আমি এটি ততক্ষণ বলবো না যতক্ষণ না আমি তোমাদেরকে এমন একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেই যার কথা তোমরা তোমাদের বৈঠকগুলোতে আলোচনা করতে। একটি পুরোনো কথার উল্লেখ করে বলেন, আমি তোমাদেরকে তা স্মরণ করাতে চাই। ইহুদীরা জিজ্ঞেস করে, সে বিষয়টি কি? হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.) বলেন, আমি তোমাদেরকে সেই তওরাতের কসম দিচ্ছি যা আল্লাহ্ তা'লা হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা কি জান, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আমি তোমাদের কাছে এসেছিলাম আর তোমরা তোমাদের সামনে তওরাত খুলে রেখেছিলে? তোমরা আমাকে সেই মাহফিল বা বৈঠকে বলেছিলে, হে ইবনে মাসলামাহ্! তুমি যদি চাও, আমরা তোমাকে আহার করাই তাহলে আমরা তোমাকে খাবার দিচ্ছি। তুমি যদি চাও যে, আমরা তোমাকে ইহুদী বানাই, তাহলে আমরা তোমাকে ইহুদী বানিয়ে দিচ্ছি। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.) বলেন, আমি তখন বলেছিলাম আমাকে খাবার খাওয়াও কিন্তু আমাকে ইহুদী বানিও না। আল্লাহ্‌র কসম! আমি কখনো ইহুদী হবো না। পরের ঘটনা হল, তোমরা আমাকে একটি প্লেটে খাবার দিয়েছিলে আর আমাকে বলেছিলে, তুমি এই ধর্ম কেবল এজন্য গ্রহণ করছ না যে, এটি ইহুদীদের ধর্ম। অর্থাৎ ইহুদীরা মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.)-কে বলেছে, এটি ইহুদীদের ধর্ম হওয়ার কারণে তুমি তা গ্রহণ করছ না। এক কথায় তুমি সেই একত্ববাদী ধর্ম গ্রহণ করতে চাও যে সম্পর্কে তুমি শুনে রেখেছ, কিন্তু আবু আমের রাহাব সেটির সত্যায়নস্থল নয়। অর্থাৎ তারা শুনেছে, নবী আসবেন, কিন্তু আবু আমের রাহাব এর ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। এরপর তারা বলে, এখন তোমাদের কাছে সেই সত্তা আসবেন, যিনি মুচকি হাসেন, যিনি যুদ্ধ করবেন, তাঁর চোখ রক্তিম বর্ণ, তিনি ইয়ামেনের দিকে থেকে আসবেন, তিনি উটে আরোহণ করবেন, তিনি চাদর জড়াবেন, তিনি স্বল্পে তুষ্ট হবেন, তাঁর তরবারি তাঁর কাঁধে থাকবে, তিনি প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলবেন, যেন তিনি তোমাদের আত্মীয় বা জ্ঞাতিভাই। আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের এই নগরীতে এখন ছিনতাই হবে ও হত্যা হবে এবং লাশ বিকৃত করা হবে। অর্থাৎ তিনি এসব কথা তাদেরকে স্মরণ করান যে,

তোমরা এগুলো বলতে। এ কথা শুনে ইহুদীরা বলে, আমরা এমনই বলতাম, কিন্তু ইনি সেই নবী নন অর্থাৎ মহানবী (সা.) সেই নবী নন। তখন হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.) বলেন, আমি আমার বার্তা পৌঁছানোর সেই দায়িত্ব পালন করেছি যা আমি তোমাদেরকে স্মরণ করাতে চাচ্ছিলাম। এরপর তিনি পরবর্তী কথা শুরু করেন এবং বলেন, মহানবী (সা.) আমাকে পাঠিয়েছেন আর তিনি (সা.) বলেছেন, **'তোমরা সেই চুক্তি ভঙ্গ করেছ যা আমি তোমাদের সাথে সম্পাদন করেছিলাম, কেননা তোমরা আমাকে প্রতারিত করার চেষ্টা করেছ।'** হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.) ইহুদীদেরকে তাদের সেই দুরভিসন্ধির কথা অবগত করান যা তারা মহানবী (সা.) সম্পর্কে পোষণ করছিল আর আমর বিন জাহাশ তাঁর ওপর পাথর নিক্ষেপ করার জন্য যে ছাদে উঠেছিল এটিও (তাদের স্মরণ করান)। একথা শুনে তারা নীরবতা অবলম্বন করে আর টু শব্দটি পর্যন্ত করেনি। এরপর হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.) তাদেরকে বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমরা আমার এই শহর থেকে বেরিয়ে যাও। আমি তোমাদেরকে দশদিন সময় দিচ্ছি, এরপর যাকেই এখানে দেখা যাবে আমি তার শিরোচ্ছেদ করব। তখন ইহুদীরা বলে, হে ইবনে মাসলামাহ্! আমরা তো ভাবতেও পারতাম না, অওস গোত্রের কোন ব্যক্তি এই বার্তা নিয়ে আসবে! হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.) বলেন, এখন মন পরিবর্তন হয়ে গেছে। ইহুদীরা কয়েকদিন পর্যন্ত প্রস্তুতি নিতে থাকে, তাদের বাহন যু-জাদর নামক স্থানে ছিল, সেগুলো আনা হয়। যু-জাদর হল, মদীনা থেকে কুবা-অভিমুখে ৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি চারণভূমি। সেখানে তারা তাদের পশুপাল চরাত আর সেখানেই তাদের বাহনগুলো ছিল, সেখান থেকে সেগুলো আনা হয়। তারা বনু আশজা' গোত্রের উট ভাড়া নেয় এবং যাত্রার জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। এটি ইতিহাস গ্রন্থের উদ্ধৃতি। **(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩১৭-৩২০, গওয়ায়ে বনী নযীর, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত), (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ (এর অনুবাদ), ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭৫৪, লাহোরের যাভীয়াহ্ প্রকাশনা থেকে ২০১৩ সালে প্রকাশিত), (মু'জিমুল বুলদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৩২)**

ইহুদীদের আচরণ কেমন ছিল, সে সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বিশেষ করে বনু কুরায়যাহ্র বিশ্বাস ঘাতকতার ঘটনা সম্পর্কে এক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেছেন, যদিও এটি হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)'র স্মৃতিচারণে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু ঐতিহাসিক দিক থেকে এখানেও এটি বর্ণনা করা প্রয়োজন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) লিখেন,

"বনু কুরায়যাহ্ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হওয়া আবশ্যক ছিল। তাদের বিশ্বাসঘাতকতা এমন নয় যা উপেক্ষা করা যেত। মহানবী (সা.) খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফিরেই তাঁর সাহাবীদের বলেন, বাড়িতে বসে আরাম করো না বরং সন্ধ্যার পূর্বেই বনু কুরায়যাহ্র দুর্গে পৌঁছে যাও। অতঃপর তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বনু কুরায়যাহ্র কাছে প্রেরণ করেন জিজ্ঞেস করার জন্য যে, তারা চুক্তি সত্ত্বেও বিশ্বাসঘাতকতা কেন করল? বনু কুরায়যাহ্ লজ্জিত হওয়া বা ক্ষমা প্রার্থনা করা অথবা কোন অজুহাত দাঁড় করানের পরিবর্তে হযরত আলী (রা.) এবং তার সাথিদেরকে যা-তা বলতে আরম্ভ করে এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর পরিবারের নারীদের গালিগালাজ করতে থাকে। আর বলে, আমরা জানি না, মুহাম্মদ (সা.) কে? তাঁর সাথে আমাদের কোন চুক্তি নেই। হযরত আলী (রা.) তাদের এই উত্তর শুনে ফিরে আসেন ততক্ষণে মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে সাথে নিয়ে ইহুদীদের দুর্গাভিমুখে যাচ্ছিলেন। যেহেতু ইহুদীরা নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করছিল আর মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রী এবং কন্যাদের সম্পর্কেও বাজে কথা বলছিল, হযরত আলী (রা.) এই ধারণায় যে, এসব কথা শুনলে তাঁর (সা.) অনেক কষ্ট হবে, তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি কেন কষ্ট করছেন? আমরাই এই যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট। আপনি ফিরে যান। মহানবী (সা.) বলেন, আমি জানি তারা গালিগালাজ করছে আর সেসব গালিগালাজ আমার কর্ণগোচর হোক তা তুমি চাইছো না। হযরত আলী (রা.) বলেন, জ্বি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! বিষয় এটাই। মহানবী (সা.) বলেন, তারা যদি গালিগালাজ করে তাহলে এতে কী-ই বা আসে যায়। মূসা নবী তো তাদের আপনজন ছিলেন। তাকে তারা এর চাইতেও বেশি কষ্ট দিয়েছিল। একথা বলে তিনি (সা.) ইহুদীদের দুর্গ-অভিমুখে এগিয়ে যান। কিন্তু ইহুদীরা (স্বেচ্ছায়) দ্বার বন্ধ করে দুর্গাবদ্ধ হয়ে থাকে আর মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করে। এমনকি তাদের মহিলারাও যুদ্ধে অংশ নেয়। তখন দুর্গের প্রাচীরের নীচে কয়েকজন মুসলমান বসেছিল, তখন এক ইহুদী নারী ওপর থেকে পাথর ফেলে একজন মুসলমানকে হত্যা করে। কিন্তু কিছুদিন অবরুদ্ধ (থাকার) পর ইহুদীরা এটি বুঝতে পারে যে, তারা দীর্ঘদিন প্রতিরোধ করতে পারবে না। তখন তাদের নেতারা মহানবী (সা.)-এর কাছে এই ইচ্ছা ব্যক্ত করে, তিনি যেন হযরত আবু লুবাবাহ্ আনসারী (রা.)-কে, যিনি তাদের

বন্ধু এবং অওস গোত্রের নেতা ছিলেন, তাদের কাছে প্রেরণ করেন যাতে তারা তাঁর (রা.) সাথে পরামর্শ করতে পারে। তিনি (সা.) আবু লুবাবাহ্ (রা.)-কে প্রেরণ করেন। ইহুদীরা তাঁর (রা.) কাছে এই পরামর্শ চায়, মহানবী (সা.)-এর এই প্রস্তাব আমরা মেনে নেব কি যে, সিদ্ধান্তের ভার আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে তোমরা অস্ত্র সমর্পণ কর? আবু লুবাবাহ্ (রা.) মুখে হ্যাঁ বলেন ঠিকই, কিন্তু নিজের গলায় এমনভাবে হাত বুলান যাতে হত্যার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অথচ মহানবী (সা.) তখন পর্যন্ত নিজের কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন নি। কিন্তু আবু লুবাবাহ্ (রা.) মনে মনে একথা ভেবে যে, তাদের এই অপরাধের শাস্তি (অর্থাৎ চুক্তিভঙ্গকারী বিরোধী ইহুদীদের এই অপরাধের শাস্তি) মৃত্যুদণ্ড ছাড়া আর কী হতে পারে। কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই ইঙ্গিতে তাদেরকে এমন একটি কথা বলেন যা পরিশেষে তাদের ধ্বংসের কারণ হয়। কাজেই, ইহুদীরা যদি মহানবী (সা.)-এর সিদ্ধান্ত মেনে নিত তাহলে অন্যান্য ইহুদী গোত্রের ন্যায় তাদেরকে সর্বোচ্চ এই শাস্তিই দেয়া হতো যে, তাদেরকে মদীনা থেকে দেশান্তরিত করা হতো। (অর্থাৎ, ইহুদীরা সিদ্ধান্ত না মেনে বলে, যদি তারা মেনে নিত তাহলে তাদেরকে দেশান্তরের শাস্তি দেওয়া হত) কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য তারা বলে, আমরা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সিদ্ধান্ত মানতে প্রস্তুত নই, বরং আমরা আমাদের মিত্র, অওস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআযের সিদ্ধান্ত মানব; তিনি যে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন, তা-ই আমাদের জন্য শিরোধার্য। কিন্তু সে সময় ইহুদীদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা হয়। ইহুদীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলে, আমাদের জাতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং মুসলমানদের আচরণ থেকে সাব্যস্ত হয়, তাদের ধর্ম সত্য; (আর) তারা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। সেই জাতির নেতৃস্থানীয় এক ব্যক্তি আমর বিন সু'দী স্বজাতিকে ভর্ৎসনা করে এবং বলে, তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছ, চুক্তি ভঙ্গ করেছ– এখন হয় মুসলমান হয়ে যাও, নতুবা জিযিয়া বা কর প্রদানে সম্মত হও। এতে ইহুদীরা বলে, আমরা মুসলমানও হব না, আর জিযিয়াও দেব না। (তাদের অধিকাংশের মত এটাই ছিল যে,) এর চাইতে মৃত্যুই শ্রেয়। তখন সেই ব্যক্তি তাদের বলে, আমি তোমাদের থেকে দায়মুক্ত হচ্ছি আর একথা বলে সে দুর্গ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য হাঁটা দেয়। তিনি যখন দুর্গ থেকে বের হচ্ছিলেন তখন একদল মুসলমান, যাদের নেতা ছিলেন মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.); তাকে দেখতে পান এবং জিজ্ঞেস করেন, সে কে। সে উত্তরে বলেন, আমি অমুক। তখন মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.) বলেন, اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنِيْ اِقَالَةَ عَثَرَاتِ الْكِرَامِ অর্থাৎ আপনি নিশ্চিন্তে চলে যান। এরপর আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! আমাকে ভদ্রলোকদের ভুলত্রুটি গোপন রাখার মতো পুণ্যকর্ম থেকে কখনও বঞ্চিত করো না। অর্থাৎ, এই লোক যেহেতু তার কৃতকর্মের জন্য এবং তার জাতির কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত, তাই আমাদেরও নৈতিক দায়িত্ব হল তাকে ক্ষমা করে দেয়া; এজন্য আমি তাকে গ্রেপ্তার না করে যেতে দিয়েছি। খোদা তা'লা আমাকে সর্বদা এমনসব পুণ্যকর্ম করার সৌভাগ্য দান করুন। এ ঘটনা জানতে পেরে মহানবী (সা.) মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.)-কে তিরস্কার করেন নি (অর্থাৎ কিছুই জিজ্ঞেস করেন নি) যে, কেন তিনি সেই ইহুদীকে ছেড়ে দিলেন; বরং তার এই কাজকে উৎসাহিত করেন" অথবা (কাজের) প্রশংসা করেন। **(দীবাচাহ্ তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলূম, ২০তম খণ্ড, পৃঃ ২৮২-২৮৪)**

অতএব, মুসলমানগণ মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা ও দীক্ষা অনুসারে সর্বদা ন্যায়সুলভ আচরণ করেছেন।

খায়বারবাসীদের দুষ্কৃতির ফলে আবু রাফে' ইহুদীর যে হত্যার ঘটনা ঘটে তা হল, তাকে হত্যার জন্য সাহাবীদের যে দলটিকে প্রেরণ করা হয়েছিল– তাতেও হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; যারা আবু রাফে' ইহুদীকে হত্যা করেছিলেন। হত্যা একজনই করেছিলেন; কিন্তু যে দলটি সেখানে গিয়েছিল, তাতে তিনিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বিভিন্ন ইতিহাস (গ্রন্থ) থেকে সংকলন করে এ ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ এভাবে দিয়েছেন,

যেসব ইহুদী নেতার নৈরাজ্যপূর্ণ ও উস্কানিমূলক আচরণের কারণে ৫ম হিজরীর শেষদিকে মুসলমানদের ওপর আহযাবের যুদ্ধের ভয়ানক বিপদ নেমে এসেছিল, তাদের মাঝে হুয়্যিই বিন আখতাব তো বনু কুরায়যাহ্'র সাথে স্বীয় কৃতকর্মের শাস্তি পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সাল্লাম বিন আবিল হুকায়েক, যার ডাকনাম ছিল 'আবু রাফে', সে তখনও খায়বার অঞ্চলে আগের মতোই স্বাধীনভাবে বসবাস করছিল এবং নৈরাজ্য ছড়ানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। বরং আহযাবের লাঞ্ছনাজনক পরাজয় এবং এরপর বনু কুরায়যাহ্র ভয়ানক পরিণতি তার শত্রুতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। আর গাতফান গোত্রগুলোর আবাসস্থল যেহেতু খায়বারের নিকটবর্তী ছিল আর খায়বারের ইহুদীরা ও নজদ অঞ্চলের গোত্রগুলো পরস্পর প্রতিবেশীর মতো ছিল, তাই এখন 'আবু রাফে', যে একজন অনেক

বড় ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল, সে নজদের বর্বর ও যুদ্ধবাজ গোত্রগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে থাকতো। আর মহানবী (সা.)-এর প্রতি শত্রুতায় সে কা'ব বিন আশরাফের অবিকল প্রতিমূর্তি ছিল। অতএব আমরা যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় সে গাতফানীদেরকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ করার জন্য প্রচুর ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করেছিল। আর ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, শা'বান মাসে বনু সা'দের পক্ষ থেকে মুসলমানদের জন্য যে আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছিল এবং যা প্রতিরোধের জন্য মদীনা থেকে হযরত আলী (রা.)'র নেতৃত্বে একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হয়েছিল– এর নেপথ্যেও খায়বারের ইহুদীদেরই হাত ছিল, যারা 'আবু রাফে'র নেতৃত্বে এসব অপকর্ম করছিল। কিন্তু 'আবু রাফে' এতেই ক্ষান্ত হয় নি। তার শত্রুতার আগুন মুসলমানদের রক্তের জন্য তৃষিত ছিল এবং মহানবী (সা.)-এর সত্তা তার চোখে কাঁটার মতো বিঁধতো। অতএব অবশেষে সে এই কূটকৌশল অবলম্বন করে যে, পুনরায় আহযাবের যুদ্ধের প্রস্তুতির আদলে নজ্‌দ-এর গাতফান এবং অন্যান্য গোত্রগুলোতে সফর করতে আরম্ভ করে এবং মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য তাদেরকে এক বিরাট সেনাবাহিনী-রূপে সংঘবদ্ধ করতে আরম্ভ করে। পরিস্থিতি যখন এমন রূপ ধারণ করে আর মুসলমানদের চোখের সামনে পুনরায় সেই আহযাবের মতো দৃশ্য ভাসতে থাকে তখন খাযরাজ গোত্রের কয়েকজন আনসারী সাহাবী মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে বলেন, এখন কোনভাবে এ নৈরাজ্যের মূল হোতা 'আবু রাফে'-র ভবলীলা সাঙ্গ করা ছাড়া এই নৈরাজ্যের আর কোন প্রতিকার নেই। মহানবী (সা.) এ কথা চিন্তা করে যে, দেশে ব্যাপক পরিসরে রক্তপাত ঘটার পরিবর্তে একজন বিশৃঙ্খলাপরায়ণ ও দুষ্কৃতকারীর নিহত হওয়া অধিক শ্রেয়; সেই সাহাবীদের অনুমতি প্রদান করেন এবং আব্দুল্লাহ্ বিন আতীক আনসারী (রা.)'র নেতৃত্বে চারজন খাযরাজী সাহাবীকে 'আবু রাফে'-র উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু যাত্রার প্রাক্কালে তিনি (সা.) তাদেরকে এই নসীহত করেন, দেখো! কোন অবস্থায়ই কোন নারী অথবা শিশুকে হত্যা করবে না। অতঃপর ষষ্ঠ হিজরীর রমযান মাসে এ দলটি যাত্রা করে এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিজেদের কাজ সম্পন্ন করে ফেরত আসে। আর এভাবে এ বিপদের ঘনঘটা মদীনার আকাশ থেকে সরে যায়। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সহীহ্ বুখারীতে রয়েছে যা এ বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা,

এতে এভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, বারা বিন আযেব (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের একটি দলকে 'আবু রাফে' ইহুদীর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন এবং তাদের ওপর আব্দুল্লাহ্ বিন আতীক আনসারী (রা.)-কে নেতা নিযুক্ত করেন। 'আবু রাফে'-র ঘটনাটি হল, সে মহানবী (সা.)-কে অনেক কষ্ট দিত এবং তাঁর (সা.) বিরুদ্ধে লোকজনকে প্ররোচিত করত এবং তাদের সাহায্য করত। আব্দুল্লাহ্ বিন আতীক (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীরা যখন 'আবু রাফে'-র দুর্গের কাছাকাছি পৌঁছে আর সূর্য অস্তমিত হয়, তখন আব্দুল্লাহ্ বিন আতীক (রা.) তাঁর সঙ্গীদেরকে পেছনে রেখে স্বয়ং দুর্গের (প্রধান) ফটকের কাছে গিয়ে গায়ে চাদরমুড়ে এমনভাবে বসে পড়েন যেন কোন ব্যক্তি কোন প্রয়োজনে বসে আছে। দ্বাররক্ষী যখন দুর্গের ফটক বন্ধ করার জন্য দরজায় আসে তখন সে আব্দুল্লাহ্ (রা.)-কে দেখে বলে, হে ব্যক্তি! আমি দুর্গের ফটক বন্ধ করতে যাচ্ছি। তুমি ভেতরে আসতে চাইলে দ্রুত চলে আস। আব্দুল্লাহ্ গায়ে চাদর জড়ানো অবস্থায়ই দ্রুত ফটকের ভেতরে ঢুকে এক দিকে লুকিয়ে পড়েন আর দ্বাররক্ষী ফটক বন্ধ করে চাবী নিকটস্থ একটি খুঁটিতে ঝুলিয়ে চলে যায়।

এরপর আব্দুল্লাহ্ বিন আতিক (রা.)'র নিজের বর্ণনা হল, আমি আমার স্থান থেকে বের হয়ে সর্বপ্রথম দুর্গের ফটকের তালা খুলে দেই যেন প্রয়োজনে দ্রুত এবং সহজেই বের হওয়া যায়। আবু রাফে' তখন একটি বৈঠকখানায় ছিল; তার আশেপাশে বহু লোক সমবেত ছিল এবং পরস্পর গল্প-গুজব করছিল। যখন এরা সবাই চলে যায় আর নীরবতা নেমে আসে তখন আমি আবু রাফে'র বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলে যাই। আমি যে সতর্কতা অবলম্বন করি তাহল, যে দরজা আমার সামনে আসতো তা অতিক্রম করে সেটি ভেতর থেকে বন্ধ করে দিতাম। অবশেষে আমি যখন আবু রাফে'র কক্ষে পৌঁছি তখন সে প্রদীপ নিভিয়ে শোবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল আর কক্ষটি ছিল পুরোপুরি অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমি আবু রাফে'কে ডাক দিলে– উত্তরে সে বলে, কে? ব্যস, তারপর আমি সেই শব্দের উৎস অনুমান করে তার ওপর হামলে পড়ি এবং তরবারি দিয়ে সজোরে একটি আঘাত করি; কিন্তু তখন ঘুট ঘুটে অন্ধকার ছিল আর আমিও খুব বিচলিত ছিলাম; তাই তরবারির আঘাত লক্ষ্যচ্যুত হয় এবং আবু রাফে' চিৎকার করে উঠে, তাই আমি (সেই) কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাই। খানিকক্ষণ পরে আমি পুনরায় সেই কক্ষে গিয়ে আমার কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে জিজ্ঞেস করি, আবু রাফে'! এই চিৎকার কোত্থেকে এসেছিল? সে আমার পরিবর্তিত কণ্ঠস্বর চিনতে পারে নি এবং বলে, তোমার মন্দ হোক, এক্ষুনি কেউ আমার ওপর তরবারির আঘাত হেনেছে। আমি এ আওয়াজ

শুনে পুনরায় তার ওপর আক্রমন করি আর তরবারি দ্বারা আঘাত করি। এবার আঘাত যথাস্থানে লাগে কিন্তু তবুও সে মরে নি, তাই আমি তার ওপর তৃতীয়বার আঘাত করে তাকে হত্যা করি। এরপর আমি তাড়াতাড়ি একের পর এক দরজা খুলে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসি। কিন্তু আমি যখন সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছিলাম তখন কয়েক ধাপ বাকি ছিল অথচ আমি মনে করি, সব ধাপ পেরিয়ে এসেছি। এরফলে আমি অন্ধকারে পড়ে যাই এবং আমার পায়ের গোছা ভেঙে যায়। আরেকটি বর্ণনায় এভাবে এসেছে, পায়ের গোছার জোড়া খুলে যায়, কিন্তু আমি সেটিকে আমার পাগড়ী দিয়ে বেঁধে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে বাইরে বেরিয়ে যাই। তথাপি আমি মনে মনে বলি, যতক্ষণ পর্যন্ত আবু রাফে'র মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত না হব আমি এখান থেকে যাব না। অতএব আমি দুর্গের কাছেই এক জায়গায় লুকিয়ে বসে পড়ি। সকাল হলে দুর্গের ভেতর থেকে কারো কণ্ঠ আমার কানে ভেসে আসে যে, হিজাজের ব্যবসায়ী আবু রাফে' মারা গেছে।

এরপর আমি উঠি এবং ধীরে ধীরে গিয়ে আমার সাথীদের সাথে মিলিত হই। অতঃপর আমরা মদীনায় ফিরে মহানবী (সা.)-কে আবু রাফে'র মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করি। তিনি (সা.) পুরো ঘটনা শুনে আমাকে বলেন, তোমার পা সামনে এগিয়ে দাও। আমি আমার পা সামনে এগিয়ে দিলে তিনি (সা.) দোয়া করে স্বীয় পবিত্র হাত সেটির ওপর বুলান। এরপর আমি এমন অনুভব করি– যেন আমি কখনও কোন আঘাতই পাইনি।

অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে, যখন আব্দুল্লাহ্ বিন আতীক (রা.) আবু রাফে'র ওপর আক্রমণ করেন, তখন তার স্ত্রী উচ্চস্বরে চিৎকার করতে আরম্ভ করে যাতে আমি বিচলিত হই, পাছে তার চিৎকার ও চেঁচামেচি শুনে আবার অন্যরা সজাগ না হয়ে যায়। এ কারণে আমি তার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে তরবারি উঠালেও মহানবী (সা.) নারীদেরকে হত্যা করতে বারণ করেছেন– এটি মনে পড়ায় আমি সেই ইচ্ছা পরিত্যাগ করি।

এরপর সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে লেখা হয়েছে, আবু রাফে'র হত্যার বৈধতার বিষয়ে এখানে আমাদের কোন বির্তকে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। আবু রাফে'র রক্তপিপাসু কর্মকাণ্ড ইতিহাসের একটি উন্মুক্ত পাতা। আর এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি ঘটনায় অর্থাৎ কা'ব বিন আশরাফের হত্যার ঘটনায় এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সে সময় মুসলমানরা অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় চতুর্দিক থেকে বিপদ কবলিত ছিল। পুরো দেশ মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হচ্ছিল। এমন নাজুক পরিস্থিতিতে আবু রাফে' আরবের বিভিন্ন গোত্রকে ইসলামের বিরুদ্ধে উসকে দিচ্ছিল। (আমি এখানে সারাংশ বর্ণনা করছি, পুরো ইতিহাস বলছি না যে, কেন তাকে হত্যা করা বৈধ ছিল?) আর আহযাবের যুদ্ধের ন্যায় আরবের বর্বর গোত্রগুলোকে একত্রিত করে পুনরায় মদীনার ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আরবে সে সময় কোন সরকার ছিল না, যার মাধ্যমে ন্যায় বিচার চাওয়া যেত। বরং প্রত্যেক গোত্র নিজ স্থানে স্বাধীন ও সার্বভৌম ছিল। কাজেই আত্মরক্ষার জন্য স্বয়ং কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। **{সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.), পৃঃ ৭২১-৭২৪}**

গত খুতবায় সরকার প্রসঙ্গে এই বিশদ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে যে, কেন এবং কি কারণ ছিল? (তখন) কোন সরকার ছিল না; আর যে সরকার ছিল তা ছিল মহানবী (সা.)-এর নিজের সরকার। যাহোক, এমন পরিস্থিতিতে সাহাবীরা যা কিছু করেছেন সেটা সম্পূর্ণ সঠিক এবং যথোপযুক্ত ছিল। আর যুদ্ধের সময় যখন একটি জাতি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থাকে তখন এমন পদ্ধতি অবলম্বনকে পুরোপুরি বৈধ মনে করা হয়।

হযরত উমর (রা.) নিজের খিলাফতকালে হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.)-কে জুহায়না গোত্রের কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহের দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। যখনই কোন গভর্নর বা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে খিলাফতের দরবারে কোন অভিযোগ আসত, হযরত উমর (রা.) তদন্তের জন্য তাকে প্রেরণ করতেন। অনুরূপভাবে হযরত উমর (রা.)ও তার ওপর দৃঢ়বিশ্বাস রাখতেন, তাই সরকারী রাজস্ব আদায়ের জন্যও হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.)-কেই পাঠানো হতো। তিনি হযরত উমর (রা.)'র দরবারে বিভিন্ন এলাকার কঠিন বিষয়াদির সমাধানের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। কুফা'য় হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন, যার তদন্ত করার জন্য তিনি হযরত উমর (রা.) প্রতিনিধি ছিলেন। এ সম্পর্কে প্রাপ্ত বিবরণ কিছুটা এমন, হযরত উমর (রা.) জ্ঞাত হন, হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন আর তাতে (একটি) দরজা রেখেছেন, যার ফলে শব্দ শোনা যায় না। অতএব, তিনি (রা.) হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.)-কে (সেখানে) প্রেরণ করেন। হযরত উমর (রা.)'র অভ্যাস ছিল, তিনি যখন স্বেচ্ছায় কোন কাজ করতে চাইতেন তখন তাকে অর্থাৎ হযরত

মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.)-কেই (সেই কাজের জন্য) প্রেরণ করতেন। হযরত উমর (রা.) তাকে বলেন, সা'দ-এর কাছে পৌঁছেই তুমি তার দরজা জ্বালিয়ে দিবে, কাজেই তিনি কুফা'য় পৌঁছেন আর সেই দরজার কাছে গিয়ে অরণি বা চকমকি পাথর দ্বারা আগুন জ্বালিয়ে সেই দরজা পুড়িয়ে ফেলেন। হযরত সা'দ (রা.) (এটি) জানতে পেরে বাইরে বেরিয়ে আসলে হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.) তাকে পুরো ঘটনা খুলে বলেন, কেন তিনি এটি জ্বালিয়েছেন। **{আল ইসাবা ফি তামীযিস সাহাবাহ্, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৮ মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.)}**

হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.) সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে, হযরত উসমান (রা.)'র শাহাদতের পর তিনি নির্জনবাস অবলম্বন করেন আর কাঠের তরবারি বানিয়ে নেন। তিনি বলতেন, আমাকে মহানবী (সা.) এই আদেশই দিয়েছিলেন। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমাকে একটি তরবারি উপহার দেন আর বলেন, এর দ্বারা মুশরিকদের সাথে জিহাদ করবে যতক্ষণ তারা তোমার সাথে যুদ্ধ করে আর যখন তুমি মুসলমানদের দেখবে, তারা একে অপরকে হত্যা করতে শুরু করেছে তখন তুমি এটি অর্থাৎ এই তরবারি দিয়ে কোন পাথরে আঘাত করবে যেন এটি ভেঙে যায়। এরপর তুমি নিজ বাড়িতেই অবস্থান করবে যতক্ষণ না তোমার কাছে কোন অপরাধীর হাত পৌঁছে বা তোমার মৃত্যু হয়। অতএব তিনি এমনটিই করেন। তাই তিনি (রা.) সকল নৈরাজ্য থেকে দূরে থাকেন আর জামাল ও সিফ্ফীনের যুদ্ধে তিনি অংশ নেন নি। **{উসদুল গাবাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩১৯; এবং আল্ ইসাবাহ্, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৯, মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.)}**

যুবায়্আহ্ বিন হুসায়েন সা'লাবী বর্ণনা করেন, আমরা হযরত হুযায়ফাহ্ (রা.)'র কাছে বসেছিলাম, তিনি আমাদের বলেন, আমি এমন এক ব্যক্তিকে জানি নৈরাজ্য যার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আমরা বললাম, তিনি কে? হযরত হুযায়ফাহ্ (রা.) বলেন, তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ আনসারী (রা.)। এরপর যখন হযরত হুযায়ফাহ্ (রা.) মৃত্যু বরণ করেন এবং বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তখন আমি সেসব লোকের সাথে বের হই যারা মদীনা থেকে বের হচ্ছিলেন, তারপর আমি একটি ঝরণার কাছে পৌঁছাই। সেখানে পর্যাপ্ত পানি ছিল। সেখানে আমি জীর্ণ ও ভাঙা একটি তাঁবু দেখতে পাই যা একদিকে হেলে পড়েছিল এবং যাতে বাতাসের ঝাপটা লাগছিল। আমি জিজ্ঞেস করি এই তাঁবুটি কার? লোকেরা বলে, এটি মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.)'র তাঁবু। আমি তার কাছে গিয়ে দেখি, তিনি একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ। আমি তাকে বলি, আল্লাহ্ আপনার প্রতি কৃপা করুন। আমি জানি, আপনি মুসলমানদের সর্বোত্তম লোকেদের একজন। আপনি আপনার শহর, বাড়িঘর, পরিবার-পরিজন এবং প্রতিবেশীদের পরিত্যাগ করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, আমি এসব কিছু মন্দের প্রতি ঘৃণার কারণে পরিত্যাগ করেছি। **(আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৯, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সালে প্রকাশিত)**

তার মৃত্যু সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী ৪৩, ৪৬ বা ৪৭ হিজরী সনে মদীনায় তার মৃত্যু হয়েছে। তখন তার বয়স ছিল ৭৭ বছর। মারওয়ান বিন হাকাম তার জানাযার নামায পড়িয়েছেন, যিনি সে সময় মদিনার আমীর ছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় এটিও উল্লেখ রয়েছে, কেউ তাকে শহীদ করেছিল। **{উসদুল গাবাহ্, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৭ মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত}, {আল্ ইসতিয়াব ফি মা'রেফাতিস সাহাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৩৩, মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১০ সালে প্রকাশিত}**

তার স্মৃতিচারণ এখানেই শেষ হল। নামাযের পর আমি একটি হাযের জানাযা পড়াব, যা সদর দ্বীন সাহেবের পুত্র জনাব তাজ দ্বীন সাহেবের (জানাযা)। গত ১০ ফেব্রুয়ারি, ৮৪ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসী ছিলেন। তিনি উগান্ডায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সনে যুক্তরাজ্যে স্থানান্তরিত হন। ১৯৮৪ সালে যখন ইসলামাবাদের ভূমি ক্রয় করা হয় তখন মরহুম ইসলামাবাদের জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর সমীপে নিজের সেবা উপস্থাপন করেন। এরপর ২২ বছর পর্যন্ত ইসলামাবাদে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে নিঃস্বার্থ সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত প্রথম জলসার আয়োজন থেকে নিয়ে শেষ জলসা পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদেরকে সম্ভাব্য সকল সুবিধা প্রদানের যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। সব ধরণের টেকনিক্যাল কাজ করতে পারতেন। এ কারণে তিনি ইসলামাবাদে দিনরাত সব ধরণের কাজ করার তৌফিক পেয়েছেন, যার মধ্যে ইলেকট্রিক, প্লাম্বিং, স্যানেটারী এবং কাঠ ইত্যাদির কাজও রয়েছে। মরহুম নামায ও রোযার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। ধার্মিক, উত্তম স্বভাব সম্পন্ন এবং আনুগত্যকারী ছিলেন। অত্যন্ত নম্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন। খিলাফতের সাথে অত্যন্ত গভীর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। তার পৌত্র মুদাব্বের দ্বীন সাহেব জামা'তের মুরব্বী, যিনি যুক্তরাজ্যের

জামেয়া থেকে পাশ করেছেন এবং বর্তমানে এমটিএ'তে কর্মরত। তিনি লিখেন, ইসলামাবাদে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষই বলেন, তিনি কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। আমার শ্রদ্ধেয় দাদা বলতেন, তিনি যখন ইসলামাবাদ এসেছিলেন তখন প্রথমদিকে তিনি একেবারে একাই থাকতেন। প্রথম দিকে বিদ্যুৎও ছিল না আর হিটিংও ছিল না। অনেক কঠিন সময় ছিল। কিন্তু তিনি এজন্য আনন্দিত হতেন যে, তিনি জামা'ত এবং যুগ খলীফার জন্য ত্যাগ স্বীকারের সুযোগ পাচ্ছেন। সময়মত নামায পড়া, নিজ হাতে কাজ করা, অতিথি আপ্যায়ন ও ধৈর্য ছিল তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গুণ। আরো অনেকেই তার এসব গুণের কথা লিখেছেন। মজীদ সিয়ালকোটি সাহেবও একথাই বলেছেন। এখানে ইসলামাবাদে তিনি একটি ওয়ার্কশপ বানিয়েছিলেন। বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহারে তিনি দক্ষ ছিলেন। লণ্ডনের বিভিন্ন কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করে ইসলামাবাদের প্রত্যেকটি ব্যারাককে তিনি পর্যায়ক্রমে আবাদ করেছেন এবং বাসযোগ্য করে গড়ে তুলেছেন। নিজের টীম গঠনের কৌশলও তিনি জানতেন। শীত-গ্রীষ্ম সব সময়ই ব্যস্ত থাকতেন। জিনিসপত্র যেহেতু পুরোনো ছিল, তাই সবকিছু ঠিকঠাক করা ও নতুনভাবে ব্যবহারোপযোগী করে গড়ে তোলা অনেক বড় দায়িত্ব ছিল যা অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে তিনি সম্পন্ন করেন। এছাড়া সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন আর এটিই বলতেন, আমার জন্য কেবল দোয়া করো। কাজের সময় তিনি দিনরাত ইসলামাবাদেই ছোট্ট একটি কক্ষে পড়ে থাকতেন। কখনোই স্ত্রী-সন্তানের কথা ভাবেন নি যারা লণ্ডনে বাস করতেন। কখনও কখনও তাদের কাছে যেতেন।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন আর তার সন্তান-সন্ততি এবং বংশধরদেরও তার মতো নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় অগ্রগামী করুন এবং ধৈর্য ও দৃঢ়তা প্রদান করুন।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৬ মার্চ, ২০২০, পৃঃ ৫-৯)
(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)